উৎসবের রং বদলেছে, বদলেছি কি আমরা ?

উৎস সবার, রাষ্ট্রও সবার । ছোটবেলায় উৎসব মানেই ছিল অন্য রকম এক আনন্দ । ঈদ আসবে কিংবা দুর্গাপূজা এই ভাবনাটুকুই যেন আমাদের দিনগুলোকে রঙিন করে তুলে। ক্যালেন্ডারের পাতায় উৎসবের তারিখ যতো এগিয়ে আসতো, মনের ভেতর আনন্দের ঢেউ ততো বাড়ে ।

নতুন জামা, বাড়িতে ভালো খাবারের আয়োজন, আত্মীয়-স্বজনের আগমন, পাড়াপড়শির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সব মিলিয়ে উৎসব ছিল আমাদের জীবনের এক বিশেষ অধ্যায় । তখন উৎসবের আনন্দের জন্য খুব বেশি আয়োজনের প্রয়োজন হতো না, প্রয়োজন ছিল কেবল একটি নির্মল মন আর কাছের মানুষগুলোর সান্নিধ্য । ঈদের চাঁদ দেখার অপেক্ষা, পরিবারের সবার সঙ্গে ঈদের প্রস্তুতি সবকিছুতেই ছিল এক ধরনের আবেগ । ঈদের দিন সকালে নামাজ শেষে পরিচিত-অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কোলাকুলি, বড়দের সালাম করা, ছোটদের স্নেহ করা এবং প্রতিবেশীদের বাড়িতে যাতায়াত এসবের মধ্যেই ঈদের প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পেতাম । কার বাড়িতে কী রান্না হয়েছে, কে নতুন জামা পরেছে, কে কোথায় বেড়াতে যাবে এসব ছিল আমাদের ছোট ছোট আলোচনার বিষয় ।

আবার দুর্গাপূজার সময় গ্রাম কিংবা শহরের পূজামণ্ডপগুলো যেন অন্য এক জগতে পরিণত হতো । প্রতিমা দর্শন, ঢাকের শব্দ, আলোকসজ্জা, মণ্ডপের সাজসজ্জা এবং মানুষের ভিড় সব মিলিয়ে চারপাশে সৃষ্টি হতো উৎসবের আবহ । মুসলমান পরিবারের সন্তান হয়েও পূজার আনন্দ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হতো না । বন্ধুদের সঙ্গে মণ্ডপে যাওয়া, পরিচিত হিন্দু পরিবারের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় কিংবা উৎসবের আয়োজন দেখতে দেখতে সময় কাটানো এসব ছিল স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের অংশ। আমাদের শৈশবের সমাজে ধর্মীয় পরিচয় ছিল, কিন্তু সেই পরিচয় সব সময় মানুষের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতো না । ঈদে হিন্দু প্রতিবেশীর শুভেচ্ছা কিংবা পূজায় মুসলমান বন্ধুর উপস্থিতি এসবের মধ্যে বিশেষ কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না, ছিল সহজ সম্পর্ক, আন্তরিকতা ও একে অন্যের আনন্দকে নিজের আনন্দ বলে অনুভব করার ক্ষমতা ।

হয়তো তখন আমরা সম্প্রীতি শব্দটির রাজনৈতিক বা তাত্ত্বিক অর্থ

বুঝতাম না, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনেই তার বাস্তব চর্চা দেখতাম । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় হয়েছি । বদলেছে জীবনযাত্রা, বেড়েছে মানুষের ব্যস্ততা, প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে করেছে গতিশীল । উৎসবের আয়োজনও হয়েছে অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ । এখন ঈদের কেনাকাটা, বিপণিবিতানের ভিড়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় কিংবা পূজামণ্ডপের আলোকসজ্জা সবকিছুতেই আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট । উৎসবের ছবি মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে হাজার মানুষের কাছে । কিন্তু কখনো কখনো মনে প্রশ্ন জাগে, উৎসবের বাহ্যিক আয়োজন যতো বেড়েছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের আন্তরিক যোগাযোগও কি ততোটা বেড়েছে?

আজ আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে শুভেচ্ছা জানাই, অথচ পাশের বাড়ির মানুষের খোঁজ নিতে ভুলে যাই । উৎসবের দিনে নতুন পোশাকের ছবি প্রকাশ করি, কিন্তু একাকী থাকা বৃদ্ধ প্রতিবেশীটির কথা মনে রাখি না । নিজেদের আনন্দের আয়োজন করি, অথচ অসচ্ছল পরিবারটির শিশুটি নতুন জামা পেয়েছে কি না, তা জানার প্রয়োজন অনুভব করি না । অবশ্যই সবাই এমন নন, আজও অসংখ্য মানুষ নীরবে অন্যের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন । তবু আমাদের সামাজিক জীবনে এই প্রশ্নগুলো অস্বস্তিকর হলেও জরুরি ।উৎসবের সৌন্দর্য কি কেবল নিজের আনন্দে, নাকি অন্যের আনন্দের অংশীদার হওয়ার মধ্যেও? ঈদের শিক্ষা আমাদের সংযম, সহমর্মিতা ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা মনে করিয়ে দেয় ।

দুর্গাপূজা আনন্দ, মিলন ও অশুভের বিরুদ্ধে শুভের প্রত্যয়ের বার্তা বহন করে । ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ধরন আলাদা হতে পারে, বিশ্বাসের পথও ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মানুষের প্রতি ভালোবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব এবং অন্যের সুখ-দুঃখের প্রতি সংবেদনশীলতা এসব মূল্যবোধের গুরুত্ব কোনো ধর্মীয় সীমানায় আটকে থাকে না । বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হলো তার বহুত্ব । এখানে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় ভিন্ন, কিন্তু একই জনপদের মাটি, একই বাজার, একই বিদ্যালয়, একই কর্মক্ষেত্র এবং দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য সম্পর্ক আমাদের একসূত্রে বেঁধে রাখে। এই সম্পর্কগুলোকে টিকিয়ে রাখা শুধু রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব নয়, প্রতিটি পরিবারের, প্রতিটি নাগরিকেরও দায়িত্ব রয়েছে । ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভেদ কিংবা বিদ্বেষের পরিবর্তে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের সংস্কৃতি গড়ে তোলা জরুরি । কারও বিশ্বাসকে ছোট না করা, অন্যের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি

সম্মান দেখানো এবং উৎসব পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এসবই একটি মানবিক সমাজের পরিচয়। সম্প্রীতি মানে সবাইকে একই রকম হতে হবে, তা নয়, বরং ভিন্নতা নিয়েই একে অন্যের পাশে থাকার নাম সম্প্রীতি।

আমরা হয়তো আবার শৈশবে ফিরে যেতে পারব না। ফিরিয়ে আনতে পারব না সেই সময়ের উঠোন, বিকেলের আড্ডা কিংবা উৎসবের আগের রাতের উত্তেজনা । কিন্তু সেই সময়ের মানবিকতাকে তো ফিরিয়ে আনতে পারি । ঈদে কিংবা পূজায় আমরা যদি নিজের পরিবারের বাইরে আরেকটি পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, প্রতিবেশীর খোঁজ নিতে পারি, ভিন্ন ধর্মের মানুষের উৎসবে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য নিয়ে পাশে দাঁড়াতে পারি, তাহলেই উৎসবের অর্থ আরও গভীর হবে। ঈদ আসুক, পূজা আসুক উৎসবের রং ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি ঘরে। সেই রং যেন শুধু আমাদের পোশাকে নয়, আমাদের চিন্তায়, আচরণে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে মিশে যায়। কারণ উৎসবের ক্যালেন্ডার প্রতি বছর বদলায়, কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যেন কখনো পুরোনো না হয়। শেষ পর্যন্ত উৎসবের প্রকৃত সৌন্দর্য আলোকসজ্জায় নয়, মানুষের হৃদয়ে, নতুন পোশাকে নয়, নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তোলায়, আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছায় নয়, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারে।

লেখক,
মাহবুবুর রহমান বকুল
এল,এল,এম – বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস (বিইউপি) মাস্টার্স – আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভেড়ামারায় পঁচা মরিচে রং দিয়ে মরিচের গুড়া তৈরি,জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পঁচা মরিচের সঙ্গে রং মিশিয়ে গুড়া মরিচ তৈরি ও বাজারজাত করার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা সংলক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

বুধবার (১১ জানুয়ারী) দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলার বারোমাইল চাঁদগ্রাম এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় বিপুল পরিমান ভেজাল মরিচের গুড়া জব্দ করা হয়। পাশাপাশি আল-বারাকাহ মসলা ও অয়েল মিল কারখানার মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, ভেড়ামারা উপজেলার বারোমাইল চাঁদগ্রাম এলাকায় আল-বারাকাহ মসলা ও অয়েল মিল নামে একটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে পঁচা মরিচের সঙ্গে রং মিশিয়ে গুঁড়া মরিচ তৈরি ও বাজারজাত করে আসছিল। খবর পেয়ে বুধবার দুপুরের দিকে ওই কারখানায় অভিযান চালায়। এতে বিপুল পরিমান পঁচা মরিচ জব্দ করা হয়। পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর (৪৩) ধারায় কারখানার মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিত করতে অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন।

এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।